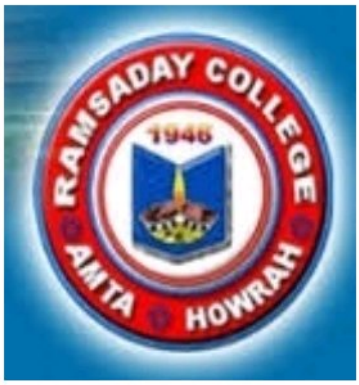

Santoshi Bhakat
Department of History
Ramsaday College
Amta, Howrah
Semester- IV

৬.১২ মুঘল ভারতের অর্থব্যবস্থা ও রাষ্ট্রের ভূমিকা

দীর্ঘদিন এক রাজবংশের শাসন এবং বিস্তৃত এলাকায় তার রাজ্যবিস্তারের ফলে মুঘল ভারতের অর্থব্যবস্থা একটি বিশেষ চরিত্র লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল। আধুনিক কালের ঐতিহাসিকদের এক বড়ো অংশ মনে করেন যে, সাম্রাজ্যের বিশালতা এবং সেই সাম্রাজ্যের ওপর সম্রাটের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব মুঘল ভারতের স্থিতাবস্থার মূল কারণ। একইসঙ্গে এই কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন ছিল নিয়মিত রসদের জোগান। তাই বলা হয় মুঘল সাম্রাজ্যের চরিত্র ছিল শোষণের চরিত্র, যা কৃষকের যাবতীয় উদ্বৃত্তকে দখল করত। একইসঙ্গে নিরন্তর যুদ্ধের প্রয়োজনে *মনসবদার*-দের অধীনে নিয়োজিত ছিল বিশাল সেনাদল। যে-কোনো যুদ্ধেই কমবেশি ২ থেকে ৩ লক্ষ সৈন্য নিবেশিত হত। এত সৈন্যের সঙ্গে ছিল প্রায় সমসংখ্যক বহক্ষেত্রেই অধিক সংখ্যক অশ্ব। তাদের রসদ, তাঁবু ইত্যাদি বহনের জন্য যেত অতিরিক্ত পরিমাণে দাস-কর্ম গবাদি পশু, হাতি, উট। অর্থাৎ যুদ্ধযাত্রায় যেত এক চলমান শহর। আবার যুদ্ধের প্রয়োজনে ও নিয়মি জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন ছিল সাজ-পোশাক, অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ, তৈজসপত্র, আসবাব প্রভৃতি এবং তাদের নির্মাণের জন্য নিয়োজিত ছিল হরেক পেশার হরেক কারিগর।

এই বিপুল যজ্ঞের বিশাল ব্যয় বহন করতে হত সাধারণ মানুষকে। যেহেতু অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর সেইহেতু কৃষির ওপর চাপ ছিল নিরন্তর। রাজস্বের অতিরিক্ত ছিল হরেক রকমের খাজনা। কিছু ছিল অবৈধ যেগুলি কেন্দ্রীয় স্তরে বেআইনিরূপে চিহ্নিত হলেও কৃষকরা তাদের হাত থেকে রেহাই পেত না। রাজস্ব আদায় হত এমন জমির অধিকাংশই ছিল *জাগীরদার*-দের অধীনে। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে প্রায় ৯৫ শতাংশ জমিই *জাগীর* রূপে বণ্টিত হয়েছিল। শাহজাহানের রাজত্বকাল থেকে রাজকোষের দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া শুরু হয় এবং *মনসবদার*-দের মাসিক বেতন কাঠামো তৈরি হলে *খালিস*-এর পরিমাণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। আওরঙ্গজেবের রাজত্বে *খালিস*-এর পরিমাণ যথেষ্টই ছিল। কিন্তু সমস্যা ছিল আরও গভীরে। *জাগীরদার*-রা ছিল বহিরাগত এবং অনবরত তাদের *জাগীর* হস্তান্তরিত হত। এর ফলে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে *জাগীরদার*-এর কোনও সম্পর্ক গড়ে উঠত না। *জাগীরদার*-এর প্রধান লক্ষ্য ছিল যত বেশি পরিমাণে সম্ভব রাজস্ব আদায় করা এবং কৃষির উন্নতি বা কৃষকের উন্নতি নিয়ে আদৌ চিন্তিত না হওয়া। অষ্টাদশ শতকে অবশ্য *ইজারা* ব্যবস্থা বহুল প্রচলিত হয় এবং বহক্ষেত্রে *জাগীর* কার্যত বংশানুক্রমিক হয়ে যায়। দেখা গেল যে, *মহাজনরা* ব্যাপকভাবে *ইজারা*-তে জড়িত। অপরদিকে *মনসবদার*-রা বহু সময়ে নিজ *জাগীর* লাভে ব্যর্থ হত বা ঠিকমতো *জাগীর* পেত না। তাদের বকেয়ার পরিমাণ ছিল ক্রমবর্ধমান। এর ফল

যারা শাসনব্যবস্থার সঙ্গে ছিল সরাসরি যুক্ত তাদের অবস্থা সবল হতে পারে [illegible]
সেনা মোতায়েন করতে পারত তারাই রাজস্ব আদায়ের নামে কার্যত লুটতরাজ করত। [illegible]
অক্ষম। তাঁর নির্দেশ মানার মতো কোনও কর্মচারী খুঁজে বের করা কার্যত [illegible]
মনুচির চোখে মুঘল সাম্রাজ্য তখন এক শোষণের প্রতিচ্ছবি ভিন্ন কিছু ছিল না। [illegible]
মনুচির বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন। তাঁর মতে মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থায় উচ্চমূল্যের কৃষিপণ্যের ওপর [illegible]
পরিমাণ আনুপাতিক হারে কমই ছিল। আবার পতিত বা অহল্যাভূমির ওপর [illegible]
চলে। অর্থাৎ কৃষককে উচ্চমূল্যের কৃষিপণ্য উৎপাদনে সর্বদা উৎসাহ জোগানো হত [illegible]
করে না তাকে করভার থেকে মুক্ত রাখা হয়েছিল। এভাবে কৃষকের হাতে কিছু উদ্বৃত্ত [illegible]
সম্রাট ফারুখসিয়রের রাজত্বকালে রচিত *হিদায়েৎউল কোয়াইদ* গ্রন্থে এ বিষয়ে বলা আছে যে, [illegible]
আত্মসাৎ করার কোনও ইচ্ছা ছিল না কারণ তা ঘটলে কৃষির ব্যাপক ক্ষতি ঘটত। তবে [illegible]
ছিলই। তারা পুরোপুরি স্থানীয় *জমিন্দার*-দের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। কিন্তু *জমিন্দার* অত্যাচারী হলে
কৃষক নিজের গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র পলায়ন করত এবং সে চিত্র ছিল স্বাভাবিক। আবার যেসব *জমিন্দার* [illegible]
শক্তিশালী (*জোরতলব*) তারা গ্রামবাসীদের জোটবদ্ধ করে *জাগীরদার*-কে সর্বদাই অবজ্ঞা করত। স্বাভাবিক
ভাবেই ওই ধরনের *জমিন্দারী*-তে কৃষকদের সার্বিক অবস্থা অনেক উন্নত ছিল।

অর্থাৎ মুঘল ভারতে উচ্চবিত্তের ও শক্তিশালী কৃষকের ওপর চাপ ছিল তুলনামূলকভাবে কম। উচ্চশ্রেণির কৃষক যারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল *খুদকাস্ত*—তারা দুইভাবে লাভবান ছিল। প্রথমত গ্রামের অনেকেই রাজস্ব আদায়কারী হিসাবে প্রশাসনের অংশ হওয়ায় নিজেদের কিছু কিছু কর ও করভার চাপাত সাধারণ কৃষকদের ওপর এবং দ্বিতীয়ত, নিজেদের দেয় রাজস্বের কিছু অংশও সাধারণ কৃষকের কাছ থেকে আদায় করত। যেহেতু রাজস্বের পরিমাণ ছিল সর্বজনীন সেইহেতু উচ্চশ্রেণির কৃষকের তুলনায় ছোটো কৃষক শোষিত হত অধিক পরিমাণে। আবার সাধারণ ছোটো কৃষকের জমির পরিমাণ ছিল কম, ফসল কম এবং উন্নতমানের অর্থকরী ফসল উৎপাদনের ক্ষমতাও কম। রাজস্ব আদায় করা হত নগদে এবং তা উৎপাদিত শস্যমূল্যের হিসাবে। সেই সূত্রে কম মূল্যের শস্য বিক্রি করে যে-অর্থ আসত তা দিয়ে যেভাবে রাজস্ব মেটাতে হত, আনুপাতিক হারে উচ্চমূল্যের ফসল বিক্রি করে নগদের পরিমাণ অধিক হওয়ায় কৃষককে রাজস্ব বাবদ জমা দিতে হত কম। এর ফলে গ্রামীণ কুসীদজীবীদের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাজস্বের দায় মেটানোর জন্য সাধারণ কৃষক সর্বদাই ওই কুসীদজীবীদের খপ্পড়ে গিয়ে পড়ত। বহুক্ষেত্রে দেখা যেত জমি চাষ করাই একটা দায়। তাই বার্নিয়ের দেখেছিলেন যে, গ্রামের পর গ্রামে বহু জমি অকর্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে।

তবে এমন ধারণা করা অনুচিত যে, মুঘল প্রশাসন কৃষকের সমস্যা নিয়ে আদৌ ভাবেনি। সম্রাট থেকে শুরু করে অধস্তন শ্রেণির *জাগীরদার*, প্রত্যেকের কাছেই কৃষকের মূল্য একটা ছিল। উৎপাদন না হলে রসদ আসবে না—এ সত্য প্রত্যেকেরই অজানা ছিল না। তাই আওরঙ্গজেব বহুবার তাঁর নির্দেশিকায় *রায়ত*-কে রক্ষা করার জন্য বলেছেন। এ বিষয়ে রসিকদাস করোরীকে দেওয়া তাঁর *ফরমান* এক অনবদ্য দলিল। ইরফান হাবিব দেখিয়েছেন যে, মুঘল সাম্রাজ্যে কোনোভাবেই *খুদকাস্ত*-এর জমি ভাড়া করা শ্রমিক দিয়ে চাষ করা সম্ভব ছিল না। অর্থাৎ ছোটো জোতের অধিকারীকে রক্ষার তাগিদ বেশ ভালোমতোই ছিল। তবে নগদে রাজস্ব আদায় করার ফলে উচ্চশ্রেণির কৃষক যে লাভবান হত এ প্রসঙ্গে আগেই লিখেছি। আবার নগদের লেনদেন চলতে থাকায় কৃষকের হাতে যে-পরিমাণ অর্থ জমা থাকত তার সাহায্যে তার পক্ষে উন্নত প্রক্রিয়ায় দ্রুত চাষ করা সহজসাধ্য ছিল। তবে এক্ষেত্রেও উচ্চশ্রেণির কৃষকের অবস্থা ছিল ভালো। নগদ অর্থের অধিক ব্যবহারে গুরুত্ব আরোপ করায় অর্থকরী তথা উন্নতমানের ফসল উৎপাদনে উৎসাহ বেশি দেখা

যায়। ইক্ষু, কার্পাস প্রভৃতি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তামাকের মতো ফসলের চাষও শুরু হয় এই সময়েই। ইতিপূর্বে ছিল না।

কৃষির এই বন্দোবস্তের ফলে গ্রামীণ সমাজ উচ্চবিত্তের খুৎ এবং কৃষিশ্রমিক *বলাহরে* কার্যত বিভক্ত হয়ে পড়ে। অবশ্য গ্রামের পরিচয় ছিল বিভিন্ন রকমের। ড. নোমান আহমদ সিদ্দিকীর গবেষণা প্রমাণ করেছে, এই শ্রেণিবিভাগের ফলে রাজস্ব আদায়ের প্রক্রিয়াতেও কী জাতীয় পার্থক্য ছিল। একই *পরগনা*-তে কিছু গ্রাম *রায়তি*, কিছু *জাগীর* এমন দৃশ্য ছিল খুবই পরিচিত। এর ফলে রাজস্ব আদায়ের পক্ষে জটিলতাও কম ছিল না।

একইভাবে মুঘল ভারতে জমির ওপর মালিকানার স্বত্বটিও ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে। যদিও জমির ওপর নিরঙ্কুশ মালিকানা কতটা ছিল এ নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে তথাপি *জমিন্দারী* বংশানুক্রমিক হওয়ায় এবং তা বিক্রির সুযোগ থাকায় মালিকানার তত্ত্ব নিয়ে খুব একটা সংশয় দেখা দেয়নি। মুঘল প্রশাসন *জমিন্দার*-কে সর্বদাই রক্ষা করার চেষ্টা করত, কারণ তাদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করতে হত। এভাবেই *জমিন্দারী* কেনা-বেচার বাজার তৈরি হল এবং ফাটকাবাজরা তাতে বহু অর্থ নিয়োজিত করেছিল। ড. মুজঃফর আলম পাঞ্জাব এবং অযোধ্যা সম্পর্কে বলতে গিয়ে এই দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় মুর্শিদকুলি খান *সুবা* বাংলায় কেবলমাত্র রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করার জন্য মাত্র ছয়টি বড়ো জমিন্দারী তৈরি করেছিলেন যেগুলি থেকে মোট রাজস্বের অর্ধেক আদায় করা হত। *সুবা* বাংলায় *জমিন্দার*-দের অধিকার এভাবেই দৃঢ় প্রোথিত হতে থাকে এবং ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালুর পশ্চাদভূমি তৈরি করে। বাংলা ছাড়া অন্যত্র যে অবস্থা বিশেষ পৃথক ছিল আক্ষরিক অর্থে মেনে নিলেও বাস্তবে তা মানা যায় না। পলাশীর যুদ্ধ ও তৎপরবর্তী সময়ে মুঘল ভারতে ভূমিরাজস্ব আদায়ের পরিমাণ তাই হ্রাস পেয়েছিল একথা বলা চলে না। ব্যতিক্রমী এলাকা অবশ্যই ছিল। সেগুলি হল মারাঠাদের দ্বারা আক্রান্ত গ্রামগুলি। বাংলাও তার ব্যতিক্রম নয়।

তবে কৃষিজাত যাবতীয় উদ্বৃত্ত যে আদায় করে নিয়ে সাম্রাজ্য রক্ষার ব্যবস্থা ছিল সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই। *মনসবদার*-দের সেনা ইত্যাদি পোষণের জন্য *জাগীর* দেওয়া হত এবং সাম্রাজ্য রক্ষায় সেনা ছিল আবশ্যিক উপাদান। অর্থাৎ পরগাছা শ্রেণির সংখ্যা ও প্রভাব ছিল বিরাট। শুধুমাত্র সেনাই নয় *মনসবদার*-দের নিজস্ব পরিবার-পরিজন এবং হরেক রকমের কর্মচারী, দাস-দাসী প্রত্যেকেই *জাগীর*-জাত অর্থে লালিত হত। নগদ বেতন এবং দৈনন্দিন উদরপূর্তির নিশ্চয়তার জন্য বহু কৃষক গ্রাম ছেড়ে যে *মনসবদার*-দের অধীনে চাকরি করত এ বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই। এর ফল ছিল মারাত্মক। কৃষি উৎপাদন মার খেল শ্রমিকের অভাবে এবং শহরে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটায় কৃষির ওপর চাপ বৃদ্ধি পেল। তবে এই বিপুল বাহিনী যে অর্থব্যবস্থার ক্ষতি করেছিল, তা বলা যায় না। এরাই দিয়েছিল দীর্ঘকালীন শান্তি ও নিরাপত্তা যার জন্য মুঘল ভারতে ব্যবসাবাণিজ্যের বিকাশ ঘটেছিল অদ্ভুত রকমের। আবার সেনাবাহিনী তথা বিপুল পরিমাণে শহরে মানুষের জন্য বহু জাতীয় কারিগরী শিল্প গড়ে ওঠে যা কৃষি অর্থনীতির ওপর চাপ কিয়দংশে হ্রাস করতে সক্ষম হয়।

অর্থব্যবস্থা ভিন্নতর পথেও পুষ্ট হয়েছিল। আকবরের রাজত্ব থেকে শুরু করে প্রত্যেক সম্রাটই কমবেশি সাম্রাজ্যের পরিকাঠামো তৈরিতে মনোনিবেশ করেছিলেন। আকবর ও শাহজাহানের কীর্তির কথা বিশ্বজুড়ে জ্ঞাত। শুধুমাত্র রাজধানী বা বড়ো বড়ো সৌধ নির্মাণই নয়, প্রশাসনের প্রয়োজনে এবং সেনা চলাচলের তাগিদে সম্রাটরা পথঘাট নির্মাণ, জলাশয় খনন, সরাই স্থাপন ইত্যাদি পূর্ত কাজ নিরন্তর করতেন। লাহোর, আগ্রা, শাহজাহানাবাদ, ফতেপুর সিক্রির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে *সুবাদার*-রাও প্রাদেশিক রাজধানীগুলি নির্মাণ করে। রাজমহল, ঢাকা, এলাহাবাদ, ঔরঙ্গাবাদ, মুর্শিদাবাদ, বুরহানপুর প্রভৃতি শহর গড়ে উঠেছিল

ব্যাপক আকার নিয়ে। এইসব পূর্তকাজ বহু মানুষের রুজির বন্দোবস্ত করেছিল। বার্নিয়ের লক্ষ করেছিলেন যে, সম্রাটের মন পাওয়ার লক্ষ্যে *মনসবদার*-রা শাহজাহানাবাদ গঠনের সময়েই তাকে কেন্দ্র করে নিজ নিজ প্রাসাদ-বাগিচা ইত্যাদি তৈরি করতে শুরু করে। এসবের ফলে যে নগদ অর্থের লেনদেন বৃদ্ধি পেয়েছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শাসকশ্রেণি যে কেবলমাত্র পূর্ত কাজেই অর্থ বিনিয়োগ করেছিল, তা নয়। তারা বাণিজ্যেও অংশ নিত বিশেষত, আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে। যেহেতু প্রশাসনের সঙ্গে অভিজাতরা যুক্ত থাকত সেইহেতু বণিকদের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল ভালোরকমের। এক্ষেত্রে রাজপরিবারভুক্ত সদস্যরাও বিরত ছিল না। নূরজাহান এবং শাহজাহান সমুদ্র বাণিজ্যে ব্যক্তিগত অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন। বিখ্যাত বণিক মীর জুমলা প্রশাসনে যোগ দেওয়ার পর ব্যক্তিগত বাণিজ্য বহুগুণ বৃদ্ধি করেন। এর ফল যে সবক্ষেত্রে ভালো ছিল, তা বলা যাবে না। এইসব উচ্চ পদাধিকারীদের বাণিজ্য একচেটিয়া চরিত্র লাভ করে এবং তার ফলে অন্যান্য বণিকদের যেমন ব্যবসা করতে বাধা দেওয়া হয় তেমনি পণ্যের যথাযথ মূল্য থেকেও উৎপাদকদের বঞ্চিত করা হত। *সুবাদার* শায়েস্তা খান এবং যুবরাজ আজিম-উস-শান-বাংলায় যে একচেটিয়া বাণিজ্য করতেন তাকে অত্যাচারের নামান্তরই বলা যেতে পারে। আওরঙ্গজেব একদা গুজরাটে বণিকদের জোর করে স্বল্পমূল্যে শস্য কিনে অধিক মূল্যে বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এর ফল কী হয়েছিল তা আমাদের জানা নেই।

মুঘল ভারতের অর্থব্যবস্থার সবথেকে দুর্বল দিকটির প্রতি তপন রায়চৌধুরি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর মতে, বিনিয়োগের ভালো ব্যবস্থা না থাকায় শাসকশ্রেণি তার বিপুল অর্থ কেবলমাত্র জমা করতেই শিখেছিল। প্রশাসনিক স্তরে নিজেদের সুবিধাভোগী চরিত্রের সুযোগে এরা বিপুল পরিমাণে রাজস্ব ইত্যাদি কুক্ষিগত করত এবং তাদের সাহায্যে ধনরত্ন ইত্যাদি সংগ্রহ করে সঞ্চয় করত। জন দ্য লায়েট আকবরের মৃত্যুকালে তাঁর ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের যে হিসাব দিয়েছেন তার মূল্য ধরা হয়েছিল ৫২ কোটি ২৪ লক্ষ ফ্লোরিন। আকবরকে ব্যতিক্রম ভাবা চলবে না কারণ, এটাই ছিল স্বাভাবিক চিত্র। স্ট্রেনসহাম মাস্টার ১৬৭৫-৮০ খ্রিস্টাব্দে পর্যটনকালে যে-দিনলিপি লিখেছেন তাতে দেখা যায় যে, বাংলার *সুবাদার* শায়েস্তা খান তাঁর ১৩ বছরের অবস্থানকালে ৩৮ কোটি টাকা সঞ্চয় করেছিলেন। প্রতিটি *মনসবদার*-ই এই পথেই সঞ্চয় করতে অভ্যস্ত ছিল। তাই কোনও *মনসবদার*-এর মৃত্যু ঘটলে সর্বাগ্রে সম্রাটের প্রতিনিধিরা এসে মৃতের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির দখল নিত এবং সরকারের কাছে বকেয়া আছে কিনা তার হিসাব নিত। বহুক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বকেয়ার থেকেও রাজকর্মচারীরা অতিরিক্ত হস্তগত করার চেষ্টা করত এবং স্বাভাবিকভাবেই তার একটা অংশ নিজেদের পকেটে ভরে নিত। এই বিপুল পরিমাণ সঞ্চিত সম্পদ উৎপাদনের কোনও কাজে লাগেনি। বিনিয়োগের অভাবজনিত সমস্যা কার্যত সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্য জুড়েই দেখা যায়।

অভিজাতশ্রেণির ধনরত্নের প্রতি লোভের পিছনেও একটি কারণ ছিল। এদের অনেকেই ছিল পারস্য, আফগানিস্তান এমনকি সুদূর মধ্য এশিয়া থেকে আগত ভাগ্যান্বেষী ও তাদের উত্তরাধিকারীর দল। ড. আতাহর আলি তাঁর গবেষণায় এইসব অভিজাতদের শ্রেণিবিভাগ দেখিয়েছেন। ১৬৭৯ থেকে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যে-তালিকা আছে তাতে দেখা যায় যে, ১০০০ *জাট* পদ ও তদূর্ধ্বে মোট ৫৭৫ জন *মনসবদার* ছিল, তাদের মধ্যে ৩৩৪ জন বিদেশি বংশোদ্ভূত, ১৮২ জন হিন্দু এবং মাত্র ৬৯ জন ভারতীয় মুসলমান। *মনসবদার*-দের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নিয়োগ করা হত এবং চাকরির প্রথম দিন থেকেই তাদের লক্ষ্য থাকত সম্পদ আহরণের। স্বাভাবিকভাবে অভিজাতরা সম্রাট ও তাঁর পরিবারের জীবনধারণের মানকে নকল করতে চাইত এবং এজন্য অর্থের প্রয়োজন মেটাতে রাজস্ব সংগ্রহে তাদের বিরাট উৎসাহ সর্বদাই দেখা যেত। অর্থাৎ গ্রাম থেকে যে-অর্থ সংগৃহীত হত তার সিংহভাগই চলে যেত রাজধানীতে অভিজাতদের বিলাসব্যসন চরিতার্থ

করার উদ্দেশ্যে। কিয়দংশ যে দেশের ভৌগোলিক সীমার বাইরেও যেত এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। এগুলো বিরাট জনসমষ্টির কাছ থেকে শোষণ করে যে-সম্পদ সংগ্রহ হত তা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ভোগের কাজে লাগত।

অবশ্য মুঘল রাজত্ব যে শোষণের একমাত্র নামান্তর, তা সিদ্ধান্ত করা যায় না। বাংলা এবং গুজরাট জয়ের পর আকবর সাম্রাজ্যে যে স্থিতাবস্থা এনেছিলেন তা দীর্ঘকাল বজায় ছিল। শিবাজীর উত্থান দাক্ষিণাত্যকে ক্ষুব্ধ করলেও উত্তর ভারতে আওরঙ্গজেবকে কোনও যুদ্ধ করতে হয়নি। অর্থাৎ যুদ্ধজনিত ব্যয়ভার প্রজাদের ওপর চাপানো হয়নি। অন্যদিকে দীর্ঘকালীন শান্তি যেমন একদিকে ব্যবসাবাণিজ্যকে পুষ্ট করেছিল তেমনি পূর্ত কাজেও গতি এনেছিল। পশ্চিম প্রান্তে গুজরাটের সঙ্গে পূর্বের বাংলার সড়কপথে বাণিজ্যিক যোগাযোগ এবং আগ্রা, আহমেদাবাদ, বুরহানপুর প্রভৃতি স্থানের উৎকৃষ্ট মানের বস্ত্র উৎপাদন, এসবই সাম্রাজ্যের কারিগরী শিল্পের ভিত্তি মজবুত করেছিল। পরবর্তীকালে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয় করার ফলে পূর্ব উপকূলের বিখ্যাত বন্দর মুসলিপত্তনমকেও বণিকরা সহজে ব্যবহার করতে পেরেছিল। এই কারিগরী শিল্পের কারণেই বহু ছোটো বড়ো শহর ও *কসবা*-র বিকাশ ঘটে এবং অকৃষিজাত অর্থনীতি পুষ্ট হয়। ইরফান হাবিবের সিদ্ধান্ত যে, উনিশ শতকে উত্তর ভারতে শহরে জনসংখ্যার যে পরিমাণ ছিল মুঘল রাজত্বে তার অপেক্ষা বহু বেশি ছিল। তবে বণিকরা যে স্বাধীনভাবে নিজেদের ইচ্ছামতো ব্যবসা করত, তা নয়। তাদের সর্বদাই স্থানীয় অভিজাত তথা রাজকর্মচারী থেকে শুরু করে দরবারের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বদান্যতার ওপর নির্ভর করতে হত। অভিজাত শ্রেণির বিপুল সম্পদ সঞ্চয়ের পিছনে এই অবস্থাও বহুলাংশে দায়ী ছিল। বাংলায় শায়েস্তা খান এক অভিনব পথ বের করেছিলেন। তিনি বণিকদের বাধ্য করাতেন তাঁর কাছ থেকে বার্ষিক ২৫ শতাংশ সুদে টাকা ধার নিতে। কিন্তু আট কি নয় মাসের মাথায় তিনি বলপূর্বক সুদ এবং আসল উভয় টাকাই আদায় করতেন। আবার সম্রাট ও অন্যান্য রাজপুত্ররা বিশেষ কিছু পণ্যের বাণিজ্যের ওপর একচেটিয়া অধিকার কায়েম রাখতেন। যেমন ১৬৩০-এর দশকে আগ্রাতে নীলের ব্যবসা এবং ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে গুজরাটে সোরার ব্যবসায় সম্রাটের একচেটিয়া অধিকার ছিল। অর্থাৎ বাণিজ্যে অনুকূল পরিবেশ প্রশাসনিক কর্তারা নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাত এবং সেই অর্থে বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতি বহুক্ষেত্রে রুদ্ধ করত।

একইসঙ্গে ছিল হাজার রকমের সরকারি বিধিনিষেধ, যেগুলির বৃহদংশই ছিল বেআইনি। আঞ্চলিক পদাধিকারীরা এইসব বিধি বেড়াজালে বণিকদের পিষ্ট করতে চাইত এবং অসৎ পথে তাদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করত। শিহাবুদ্দীন তালিশ সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে এই জাতীয় সমস্যার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সামান্য ফুল বিক্রেতা থেকে শুরু করে মাটি বিক্রেতাকেও শুল্ক দিতে হত। ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতার কাছ থেকে তার আয়ের ২.৫ শতাংশ *জাকাত* হিসাবে বাধ্যতামূলকভাবে আদায় করার পরও তাকে অন্যান্য শুল্ক দিতে বাধ্য করা হত। আওরঙ্গজেব বণিকদের দুর্ভোগ দূর করার চেষ্টাও করেন। আলি মুহম্মদ খান তাঁর *মীরাট-ই-আহমদী*-তে লিখেছেন যে, সম্রাট খাদ্যপণ্যের ওপর থেকে যাবতীয় *রাহদারি* (পথকর) তুলে দেন। কিন্তু তাঁর নির্দেশ বলবৎ হয়েছিল কিনা, তা সঠিক জানা যায় না।

শুল্ক ধার্যের ক্ষেত্রেও ধর্মগত তারতম্য ছিল। হিন্দু বণিকদের যখন আয়ের ওপর ৫ শতাংশ হারে *শুল্ক* দিতে হত তখন মুসলমানদের দিতে হত ২.৫ শতাংশ হারে। আওরঙ্গজেব মুসলমানদের ওপর ওই শুল্ক প্রত্যাহার করেন। হিন্দুদের আবার বছরের শুরুতে যাবতীয় শুল্ক অগ্রিম জমা করতে হত। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালেই এসেছিলেন পর্যটক নিকোলো মানুচি (১৬৯৯-১৭০৯ খ্রি.)। তাঁর ভাষায়, করভার হিন্দু বণিকদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। অবশ্যই আওরঙ্গজেব ধর্মীয় উন্মাদনার দ্বারা চালিত হয়েছিলেন। বাড়তি করের চাপ সহ্য করতে না পেরে হিন্দুরা ইসলামে ধর্মান্তরিত হবে এমনই এক ধারণা তাঁকে চালনা করেছিল।

এত আর্থিক চাপের মধ্যেও ব্যবসার জগৎ থেকে হিন্দুদের হঠানো সম্ভব হয়নি। অনুমান করা যায় যে ব্যবসার মুনাফা এতই বেশি পরিমাণে ছিল যে যাবতীয় চাপ সহ্য করার ক্ষমতা হিন্দুরা পেয়েছিল। গুজরাটি বণিকদের আর্থিক সঙ্গতি প্রবাদের পর্যায়ে পৌঁছেছিল। আলি মুহম্মদ খান লিখেছেন যে, একজন গুজরাটি বণিক যে-কোনও ইউরোপীয় কোম্পানির পুরো বছরের বিনিয়োগের অর্থ এক লহমায় জোগাতে সক্ষম ছিল। অনেক সময়ে শক্তিশালী বণিকরা দলবদ্ধভাবে বা একক চেষ্টাতে বহু সরকারি নিপীড়ন রোধ করেছিল। ১৬৬৮-৬৯ খ্রিস্টাব্দে বলপূর্বক ধর্মান্তকরণের বিরুদ্ধে সুরাটের বণিকরা তুমুল প্রতিরোধ তৈরি করে। বহুক্ষেত্রে বণিকদের প্রভাব সরকারি ব্যবস্থাকে বানচাল করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। গুজরাটে *সুবাদার* থাকাকালে আওরঙ্গজেব বিখ্যাত জৈন বণিক শান্তিদাসের মন্দির ভেঙে দেন। শান্তিদাস ছিলেন শাহজাহানের ব্যক্তিগত বন্ধু। সম্রাটের নির্দেশে সেই মন্দিরকে নতুন করে গঠন করতে হয়েছিল।

মুঘল প্রশাসনে বণিকদের প্রতি ব্যবহারকে ড. তপন রায়চৌধুরি পরস্পরবিরোধী বলে আখ্যায়িত করেছেন। একদিকে সম্রাট ও শাসককুল সাম্রাজ্যের আর্থিক অবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য ব্যবসাবাণিজ্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, অপরদিকে অধস্তন অভিজাত ও কর্মচারীরা ব্যক্তিগত স্বার্থে বণিকদের ওপর নানাবিধ চাপ সৃষ্টি করত। এক্ষেত্রে শ্রেণিগত স্বার্থ কোনোভাবেই রক্ষিত হত না। উপরন্তু বিদেশি পণ্যের প্রতি অধস্তন কর্মচারীদের লোভ ছিল মারাত্মক। সামান্য একটি বিদেশি খেলনা কী গন্ধদ্রব্যের বিনিময়ে বহুক্ষেত্রে ইউরোপীয় বণিকরা মোটা টাকার সুবিধা আদায় করে নিত এবং বলাই বাহুল্য যে সেই সুবিধা সামগ্রিকভাবে সাম্রাজ্যের ক্ষতি করত, যে-ক্ষতি শাসককুলের কাছে ছিল অধিকমাত্রায়। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষপর্ব থেকে এইসব অরাজকতা আরও ব্যাপক আকার নিতে থাকে। দেশীয় বণিকরা একদিকে যেমন নগদের সমস্যায় জর্জরিত হতে থাকে তেমনি অপরদিকে বিদেশিরা ধীরে ধীরে বহির্সমুদ্রের বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার কায়েম করে ফেলে। আওরঙ্গজেবের মৃত্যু সাম্রাজ্যের ভাঙনকে ত্বরান্বিত করল এবং আঞ্চলিক শক্তির বিকাশ ঘটতে দেখা গেল। কিন্তু সেক্ষেত্রেও জটিলতা কম ছিল না। ভারতের রাজনৈতিক প্রভুরা তখন এতই দুর্বল যে, নিজেদের অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে বিদেশি কোম্পানিগুলির দ্বারস্থ হতে হল। ১৭৪০-এর দশক থেকে তার সূচনা। কর্ণাটকের নবাবের পদকে কেন্দ্র করে বিদেশি বণিকদের প্রভাব যেভাবে অনুভূত হল তা মাত্র ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দেই পলাশীতে চরম জয়ের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ হয়।